কারা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলো এবং কার স্বার্থে-পর্ব ১

লিখেছেনঃ সুনীতি কুমার ঘোষ

পরিস্থিতি এমন ছিল যে বাংলার ভাগ্য বাংলার জনগণের উপর নির্ভর করছিল না, নির্ভর করছিল সম্পূর্ণ বাইরের তিনটে শক্তি উপর- তাদের মধ্যে আপস ও চুক্তির উপর। আমরা দেখবো এই তিনটি শক্তির মধ্যে দুটি শক্তি- ব্রিটিশ **সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব প্রস্তুত ছিল বাংলাকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বাইরে অবিভক্ত রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করতে;** কিন্তু **স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না অন্য শক্তিটি অর্থাৎ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। এবং তাঁদেরই চাপে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়।**

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা কংগ্রেস যখন কার্যত নাকচ করে দিল তখন নতুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীরা একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এর বিস্তৃত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই।[See Ghosh, India and the Raj,II.297-8. For a brief discussion of the plan]] শুধু উল্লেখ করবো যে, এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল স্থির করার যে তাঁরা হিন্দুস্থানে যাবেন, না অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিলে আলাদা গ্রুপ তৈরি করবেন অথবা স্বাধীন থাকবেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে একটি বাছাই করে নেওয়ার। **এই তিনটি সম্ভাবনা ছিল:**

(১) সমগ্র বাংলা (ও পাঞ্জাব) হিন্দুস্থানে অথবা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারে;

(২) বাংলা (ও পাঞ্জাব) বিভক্ত হতে রাজি হয়ে এক অংশ হিন্দুস্থানে এবং অন্য অংশ পাকিস্তানে যেতে পারে; এবং

(৩) বাংলা (ও পাঞ্জাব) ঐক্যবদ্ধ থেকে পৃথক রাষ্ট্র হতে পারে।

তৃতীয় বিকল্পের বিরুদ্ধে নেহেরুর জোরালো আপত্তিতে এই পরিকল্পনাও নাকচ হয়ে যায় [TOP.X, 756, 762-3] । রিফর্মস কমিশনার ভি. পি. মেননকে ভার দেওয়া হয় নতুন পরিকল্পনা রচনা করার। এই পরিকল্পনার রূপরেখা আগের ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারিতে প্যাটেলের সঙ্গে পরামর্শ করে মেনন তৈরি করেছিলেন।[Menon to Patel, 10th May 1947. Durga Das (ed.) op cit., V, 113-7:Menon, op cit., 358-9] তাতে ঐ তৃতীয় সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া হয়।

অর্থাৎ বাংলাকে (ও পাঞ্জাবকে) হয় সমগ্রভাবে হিন্দুস্থানে বা পাকিস্তানে যেতে হবে আর নয়তো দ্বিখণ্ডিত হতে হবে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বাইরে ঐক্যবদ্ধ বাংলার (বা পাঞ্জাবের) অস্তিত্ব থাকবে না। অন্য প্রদেশগুলিকে হয় হিন্দস্থানে নয় পাকিস্তানে যেতে হবে। এই মেনন-প্যাটেল পরিকল্পনাই মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

এর আগে ১৯৪৭-এর ৪ঠা মার্চ ভারত সচিবের একটা স্মারকলিপিতে তিনটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল: ***(১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাকিস্তান; (২) আসাম-সহ হিন্দুস্থান; এবং (৩) বাংলা।*** ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত ও বর্মা কমিটি প্রদেশগুলিকে, বিশেষ করে বাংলাকে, যদি তারা চায় তাহলে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক থাকার অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল। ১৭ই মে ১৯৪৭ তারিখের একটি স্মারকলিপিতে ভারতসচিব লিস্টওয়েল বলেছিলেন যে, "ঐক্যবদ্ধ থাকার ও নিজের সংবিধান নিজে রচনা করার অধিকার নিশ্চয়ই বাংলাকে এবং সম্ভবত পাঞ্জাবকেও দেবার পক্ষে যুক্তি আছে।" [TOP. IX, 842: X, 834, 876-8)] ।

২৩ মে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এটলী বলেছিলেন: "যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত সংযুক্ত সরকারের ভিত্তিতে উত্তর-পূর্বে বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে- তার উজ্জ্বল আশা আছে।" (ইতিমধ্যে শরৎ বোস-আবুল হাশিম কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাংলার কংগ্রেস-লীগ নেতাদের চুক্তি প্রকাশিত হয়েছিল।) একই দিনে ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের কাছে প্রেরিত

টেলিগ্রামে এটলী "উপমহাদেশে দুটি বা সম্ভবত তিনটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের" সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।[ibid., 964] ।

Huseyn Shaheed Suhrawardy

মাউন্টব্যাটেন নিজেও কিছুদিন ধরে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক ঐক্যবদ্ধ বাংলার কথা চিন্তা করেছিলেন। ২৬শে এপ্রিল সুরাবর্দি **(বাংলাদেশের জাতীয় নেতা সোহরাওয়ার্দীকে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা এই অপনামে ডাকে। অথচ ইংরেজিতে তাঁর নামের বানান হচ্ছে Suhrawardy-সম্পাদক)** যখন মাউন্টব্যাটেনের কাছে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব করেন এবং বলেন যে "যথেষ্ট সময় পেলে তিনি বাংলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস করেন", তখন এই প্রস্তাবের পক্ষে মাউন্টব্যাটেনের সমর্থন ছিল [ibid., 459] ।

ওই দিনেই তিনি জিন্নাকে সুরাবর্দির (সোহরাওয়ার্দী) কথা জানান এবং জিন্নার সম্মতি পেয়েছিলেন [ibid.,452]। ২৮শে এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন বারোজকে জানালেন যে, তাঁর এবং তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীদের "পরিকল্পনা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকে পৃথক অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। জিন্না কোনো আপত্তি করবে না"[ibid.,472] ।

পৃথক স্বাধীন দেশ হবার সম্ভাবনা যাতে বেশি হয় সেইজন্য ১লা মে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব দিলেন যে, বাংলা থেকে নির্বাচিত সংবিধান সভার সদস্যরা প্রথমে ভোট দিয়ে ঠিক করবেন যে তাঁরা স্বাধীন বাংলার পক্ষে, না হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে যোগদান করতে চান। পরে তাঁরা বাংলা ভাগ হবে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন [ibid., 511-2, 539,551]।

২রা মে বারোজকে মাউন্টব্যাটেন জানালেন, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য আর একটা বিকল্প হিসাবে বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সমস্ত ভোটদাতাদের মতামত গ্রহণ করার উপর জোর দেওয়া যেতে পারে [ibid., 554-5]। ৩রা মে কিরণশঙ্কর রায় যখন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন তখন সংবিধান সভার সদস্যদের ভোটভুটির মাধ্যমে অথবা গণভোটের মাধ্যমে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন থাকার অধিকার দেবার যে পরিকল্পনা মাউন্টব্যাটেন করেছিলেন তার কথা কিরণশঙ্করকে বললেন। মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে কিরণশঙ্কর যখন শুনলেন যে সুরাবর্দি (সোহরাওয়ার্দী) যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও সংযুক্ত মন্ত্রিসভাতে সম্মত তখন তিনি উল্লসিত হলেন [ibid., 586]।

৪ঠা মে বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে চিঠির মাধ্যমে ও টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, বাংলার জনগণের মতামত নেবার জন্য গণভোট হতে পারে, তার জন্য কমপক্ষে তিন মাস সময় লাগবে [ibid., 615, 714]। তখন স্থির ছিল যে ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে। অতএব বাংলায় গণভোট সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, না বিভক্ত হবে- এই প্রশ্নটি শুধু সেদিনের ৬ কোটির কিছু বেশি বাঙালীর কাছে নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

৭ই মে'তেও মাউন্টব্যাটেন বলেছেন যে, সুরাবর্দি (সোহরাওয়ার্দী) তাঁকে জানিয়েছেন যে **জিন্না স্বাধীন বাংলাতে রাজি আছেন** [ibid., 657]। মাউন্টব্যাটেন তখন ঐ প্রশ্নে গণভোট বা সাধারণ নির্বাচনের কথা ভাবছিলেন। **কিন্তু তার পরেই মাউন্টব্যাটেনের মত সম্পূর্ণ বদলে গেলো।** ৮ই মে'তে তিনি তাঁর চিফ অব স্টাফ লর্ড ইসমে (Lord Ismay)-কে লন্ডনে টেলিগ্রাম করে জানালেন, ভি. পি. মেননের মাধ্যমে প্যাটেল ও নেহরু জানিয়েছেন যে যতদিন না নতুন সংবিধান সম্পূর্ণ তৈরি হচ্ছে ততদিনের জন্য তাঁরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস (ডোমিনিয়ন স্টেটাসের আর কোনো শোভন নাম নেই) নির্দিষ্ট সময়ের আগে চান। ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ এগিয়ে দিতে হবে। মাউন্টব্যাটেন লিখলেন :

"এ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে যত সুযোগ এসেছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং [এই সুযোগের ব্যবহারে] আমরা অবশ্যই প্রশাসনিক বা অন্য কোনো বাধা মানবো না"[ibid.,699-emphasis added]।

৯ই মে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রতিনিধিকে প্যাটেল বললেন, তাঁরা চান শীঘ্র ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া

হোক [ibid., 716-emphasis added]। ১০ই মে মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর সহকর্মীদের এক বৈঠকে নেহরু বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক [ibid.,732-emphasis added]।

ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি ডোমিনিয়ন (অবশ্য পরিবর্তিত নামে) থাকবে এই ইচ্ছা জানিয়ে নেহরু ও প্যাটেল যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে মাউন্টব্যাটেনের উল্লাসের কারণ ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে চাইছিল যে ভারত ডোমিনিয়ন বা 'কমনওয়েলথ'-এর সদস্য থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক মারাত্মক পর্যায়ে, ১৩ই এপ্রিল ১৯৪৩-এ, ভারতসচিব লিওরপাল্ড এমেরি (Leopold Amery) প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে লিখেছিলেন : "আগামী দশ বছর ভারতবর্ষকে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখা আমাদের সামনে সব থেকে বড় কাজ… (এবং) ব্রিটিশ কূটনীতির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত"[TOP.III, 895-7-emphasis added]।

একই মর্মে এমরি ৯ই মে ১৯৪৩-এ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেনকেও লিখেছিলেন[ibid.,955]। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত-বর্মা কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল- "ভারতকে কমনওয়েলথ-এর মধ্যে রাখা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে"[ibid., IV,333-4]। এ থেকে কিছু আভাস পাওয়া যায়, ব্রিটিশ শাসকরা ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে রাখার উপর কী গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের সামরিক বাহিনীর প্রধানরা 'কমনওয়েলথের কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ' ("the linchpin in the structure of the Commonwealth") বলেই ভারতকে গণ্য করেছিলেন। তাঁরা এ কথা বারবার বলেছেন [ibid.,VIII,224;VI.561,659-60,666:passim.Emphasis added]।

মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় মনোনীত করে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী এটলি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : সম্ভব হলে ব্রিটিশ কমনওয়েলেথের মধ্যে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে এককেন্দ্রিক একটি সরকার ("a unitary Government") হবে সেটাই ব্রিটিশ সরকারের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।… **প্রথমত** ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাঙন যাতে না হয় তার এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ভিত্তি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বজায় রাখার বিরাট গুরুত্বকে আপনি ভারতীয় নেতাদের উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করবেন। **দ্বিতীয়ত,** ভারত মহাসমুদ্র অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যাপারে সহযোগিতার ক্রমাগত প্রয়োজন- যার জন্য দেশের মধ্যে একটা চুক্তি হতে পারে- তার কথাও আপনি বলবেন [ibid., iX, 972, 973-4-emphasis added]।

অনেকে মনে করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসানের আগে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিল। এ নিছক অনুমান ও ভুল। এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা পরে যোগ করবো।

কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা গোপনে আরও জানিয়েছিলেন যে, <u>সাময়িক কিছু সময়ের জন্য ডোমিনিয়ন স্টেটাসের কথা বললেও তাঁদের ভারতবর্ষ কখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে না। তবে তাঁদের এই আশ্বাস গোপন রাখতে হবে</u>, না হলে কংগ্রেস সংগঠনকে ডোমিনিয়ন স্টেটাসে রাজি করানোতে অসুবিধা হবে। মাউন্টব্যাটেনের মত এটলিও খুবই খুশি হয়ে ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের সেই সংবাদ জানিয়েছিলেন [ibid.,X, 974-5-emphasis added]।

মাউন্টব্যাটেন ১১ই মে টেলিগ্রাম করে লন্ডনকে জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের অবশ্যই ১৯৪৭ সালের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিতে হবে। তারপর তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কি কি লাভ হবে তা তিনি উল্লেখ করেছেন [ibid., 774]।

অতএব মাউন্টব্যাটেন ঠিক করলেন যে, বাংলার জনমত জানার জন্য গণভোট বা সাধারণ নির্বাচন হবে না, এমনকি বাংলার আইনসভার সদস্যরা বাংলা অবিভক্ত পৃথক রাষ্ট্র থাকবে তার পক্ষে ভোট দেবার অধিকার পাবে না। সমগ্র বাংলা যাবে হিন্দুস্থানে বা পাকিস্তানে, অথবা দু'টুকরো হবে এবং এক টুকরো যাবে হিন্দুস্থানে ও অন্য টুকরো যাবে পাকিস্তানে- শুধু এর উপরেই আইনসভার সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন। **সাম্রাজ্যের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলার কোটি কোটি মানুষের স্বার্থকে বলি দিতে হবে।**

বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক রাষ্ট্র হবে তাতে মুসলিম লীগ নেতাদের সম্মতি ছিল। ২৬শে এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন যখন জিন্নাকে সুরাবর্দির (সোহরওয়ার্দী) স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রস্তাবের কথা বললেন তখন জিন্না একটুও ইতস্তত না করে বলেছিলেন, "আমি আনন্দিত হবো... তারা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন থাকুক সেটাই ভালো হবে" [ibid.,452]।

২৮শে এপ্রিল মাউন্টব্যাটেনের প্রধান সচিব মিয়েভিল (Mieville)-এর সঙ্গে আলোচনার সময় লীগের সাধারণ সম্পাদক **লিয়াকত আলী খাঁ** বলেছিলেন,

"বাংলা কখনও বিভক্ত হবে না এই তাঁর বিশ্বাস, তাই তিনি বাংলা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। তিনি মনে করেন যে, বাংলা হিন্দুস্থানে বা পাকিস্তানে যোগদান করবে না এবং পৃথক রাষ্ট্র থাকবে"[ibid.,479]। জিন্না ও লিয়াকত তাঁদের এই সম্মতি বারবার জানিয়েছেন[ibid., 472, 512, 554-5, 625, 657]।

কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বরাবর বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। আমরা দেখেছি, **পাকিস্তান হোক আর না হোক, তবু বাংলাকে ভাগ করতে হবে- এই ছিল তাঁদের অন্যতম দাবি।** তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলাকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে পঙ্গু করতে। বিড়লা প্রমুখ মাড়োয়ারী বড় মুৎসুদ্দিদের ঘাঁটি কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গকে তাঁরা কখনো হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে, বাংলা বয়স্ক ভোটাধিকার, যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী, সম্মিলিত মন্ত্রিসভা, নিজস্ব সংবিধানসভা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তার সংহতি অটুট থাকবে এবং বাকি ভারতের সঙ্গে সে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। এই নতুন বাংলায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়াইয়ের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের উৎখাতের জন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াই শুরু হবে, অগ্রগতি ও বিকাশের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। কিন্তু এই সম্ভাবনা কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বিনষ্ট করে দিল এবং অন্তহীন ট্রাজেডির শিকার হতে বাংলাকে বাধ্য করলো।

পরের পর্ব –পর্ব ২

উৎসঃ সুনীতি কুমার ঘোষ, কারা বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করলো এবং কার স্বার্থে, হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ, সময় প্রকাশন, ২০১২ (পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৭)

[**নোটঃ** যেই সোর্স থেকে লেখক সবচেয়ে বেশী রেফারেন্স দিয়েছেন সেটি হচ্ছে Mansergh, N. (Editor-in-Chief), Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7, যার সংক্ষেপ হচ্ছে (TOP), এটি ১২ ভলিউমের রচনা। ibid মানে হচ্ছে ***পুর্বোল্লেখিত***, বাংলায় অনেকে লিখেন ***'প্রাগুপ্ত'- সম্পাদক***]

পর্ব-২

১৯৪৭-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি নেহরু বলেছিলেন : "পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হবে; আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই এ কথা বলছি"[Mansergh, N. (Editor-in-Chief), Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7, সংক্ষেপে(TOP), X., 337.fn.2)]। তিনি বলছেন যেন তিনি পাঞ্জাব ও বাংলার ভাগ্যবিধাতা। কেমন করে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা এই ভূমিকা পালন করতে পারলেন? তাঁরা পেরেছিলেন এই জন্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে সংকটের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের উপর- অর্থাৎ হিন্দু ও পার্শি বড় বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের উপর- নির্ভর করছিল ভারতবর্ষে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। মুসলিম নেতৃত্বের অপেক্ষা এইসব ব্যাপারে তাঁরা অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন। তার প্রমাণ তাঁরা আগেই দিয়েছেন।

তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভবিষ্যতে তাঁদের কাছ থেকে আগের থেকে আরও বড় ভূমিকা আশা করছিল। এশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা চাইছিল। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে তার মুৎসুদ্দিদের স্বার্থের কিছু গৌণ দ্বন্দ্ব থাকলে প্রধানত মিল ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সংকটময় দিনে যখন চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে

মুক্তিসংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে, যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঢল নেমেছে, তখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার হিন্দু ও পার্শি বড় মুৎসুদ্দিদের স্বার্থের মিল বড় হয়ে দেখা দিল [see Ghos, India and the Raj. II. 313-7: India's Nationality Problem and Ruling Classess. 36-8]। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইকে দমন করার জন্যই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রতিহত করার জন্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর নির্ভর করছিল।

আর. জে. মুরের (R. J. Moore-এর) কয়েকটি কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি লিখেছেন : "The co-operation of Congress... seemed necessary to preservation of the now uncertain internal order and the security of the Indian Ocean area... The best security for commercial and financial interests lay in an orderly transfer and the continuation of collaborative arrangements that had prospered before and during the war (when leading magnates were associated with governmet)... Mountbatten's realpolitik flowed from his recognition of Congress goodwill as essential to Britain's post-imperial interest. To a greater degree than has been acknowledged Congress called the cards in the last rubber of the endgame : in the accelerated transfer of power; in the severe treatment of Jinnah and his claims; in the persuasion of the princes to accede to a dominion " [R. J. Moore, Endgames of Empire, 5, 7: See also H.M. Seervai, Partition of India: Legend and Relaity, Bombay, 1989, 124]. অর্থাৎ সংক্ষেপে ভারতের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল।... যুদ্ধের সময়ে ও তার আগে নেতৃস্থানীয় পুঁজিপতিদের ও সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সুশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে তাকে টিকিয়ে রাখা-এর উপর নির্ভর করছিল ব্রিটিশরাজের বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থের শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা... [প্রত্যক্ষ] সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের পর ব্রিটেনের স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেসের সদিচ্ছা একান্ত প্রয়োজন- এই উপলব্ধি ছিল মাউন্টব্যাটেনের রাজনীতির মূলে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এগিয়ে নিয়ে আসা ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে কংগ্রেস তার দাবি আদায় করেছিল।

২৫শে মে লন্ডনের নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার সংবাদদাতাকে নেহরু বললেন : "[ভারতীয়] ইউনিয়নের মধ্যে যদি থাকে তবেই শুধু আমরা ঐক্যবদ্ধ বাংলায় রাজি হতে পারি" [TOP, X, 1041, see also ibid,1013 for Nehru's conversation with Mievile on the same day]। মাউন্টব্যাটেন তখন লন্ডনে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। মন্ত্রিসভার ভারত ও বর্মা কমিটির দৃষ্টি 'নিউজ ক্রনিকল'-এর রিপোর্টের প্রতি আকর্ষণ করে তিনি বলেন : "এই ঘটনার পর বাংলার ঐক্যকে রক্ষা করার এবং তাকে ভারতবর্ষে তৃতীয় ডোমিনিয়ন-রূপে প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে" [ibid., 1014]।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করে মে মাসের শেষে মাউন্টব্যাটেন লন্ডন থেকে ফিরলেন। মন্ত্রিসভা তাঁর হাতে প্রচারের জন্য ঘোষণার দুটি খসড়া দিয়েছিল। একটি খসড়া ছিল যদি বাংলার বিভক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে; আর একটি ছিল যদি সম্ভব বলে মনে হয় যে বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। ৩১শে মে তারিখে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বললেন :

"ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে যে সম্মত আছে তা ঘোষণা করেছে- বাস্তবিক প্রধান দলগুলি যাতে সম্মত, বাংলার জন্য এমন যে কোনো সমাধানে তারা রাজি হতে প্রস্তুত।" তিনি আরও বললেন, "পণ্ডিত নেহরু বলেছেন যে বাংলা স্বাধীন হবে তাতে তিনি রাজি হবেন না " [ibid., XI.2]।দুটি প্রধান দলের মধ্যে একটি দল-মুসলিম লীগ-রাজি ছিল; ব্রিটিশরাজও রাজি ছিল; কিন্তু প্রধান দলের মধ্যে অন্যটি-কংগ্রেস- রাজি ছিল না। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জন্যই বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলো।

জয়া চ্যাটার্জির বই Bengal Divided- এ বাংলার প্রতিনিধি-স্থানীয় হিন্দু- মুসলমান নেতাদের অবিভক্ত স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে 'অলীক স্বপ্ন (aepipe-dream)' বলে উপহাস করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক হোক আর না হোক, এই বইয়ে

বাংলা-বিভাজনে গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলদের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ আড়াল করা হয়েছে।

৩রা জুন আনুষ্ঠানিকভাবে 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত পরিকল্পনা গৃহীত হলো। স্থির হলো 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসে'র ভিত্তিতে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্র হবে। বাংলার আইনসভার সদস্যরা ভোট দিয়ে ঠিক করবেন সমগ্র বাংলা হিন্দুস্থান, না পাকিস্তানে যাবে, অথবা বাংলাকে ভাগ করে একটা অংশ হিন্দুস্থানে ও অপর অংশ পাকিস্তানে যাবে। বাংলা অবিভক্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে সেই প্রশ্নের উপর ভোট দেবার অধিকার থাকবে না। পরে যে তাঁদের ভোট হলো সেটা সম্পূর্ণই আনুষ্ঠানিক।

অনেকের ধারণা আছে যে, অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনার প্রতি গান্ধীর সমর্থন ছিল। এই বিষয়ে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ৮ই মে ১৯৪৭ ও তার পরবর্তী কয়েকদিন শরৎ বোস, আবুল হাশিম, কিরণ শঙ্কর রায়, সুরাবর্দি (সোহরাওয়ার্দী), মহম্মদ আলি ও সত্যরঞ্জন বক্সি ঐক্যবদ্ধ বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে সোদপুরে গিয়েছিলেন। আবুল হাশিম গান্ধীকে বলেছিলেন,

"বাঙালীদের একই ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং একই ইতিহাস যা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে ঐক্যবদ্ধ করেছে। হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, বাঙালী বাঙালী, এবং ১০০০ মাইলেরও বেশি দূরের পাকিস্তানিদের শাসনকে ঘৃণা করে"[Cited in Sunil Das. "The Fateful Partision and the Plan of Independent Sovereign Bengal", Sarat Chandra Bose Commemoration Volume, 79]।

বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হবার পর শরৎ বোস তার কপি গান্ধীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাটনা থেকে ২৪শে মে গান্ধী শরৎ বোসকে লেখেন:

"শুধু অধিকাংশের ভোটে কিছু হবে না এমন কিছু শর্ত খসড়া চুক্তিতে নেই। শাসন ক্ষমতায় ও যাঁরা আইনসভায় থাকবেন তাঁদের মধ্যে অন্তত দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু সদস্যদের সমর্থন [অবিভক্ত বাংলা] সরকারের প্রতিটি কাজ (বা আইন) (Everyday act of Government)-এর পিছনে থাকতে হবে " [CWG. LXXXVII, 526-emphasis added] । শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নয়, (যেমন ভারতের বা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নে) সরকারের প্রত্যেকটা কাজ বা আইনের পিছনে দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু সদস্যের সমর্থন চাই।

এই নীতির ভিত্তিতে কোনো সরকারের পক্ষে কাজ করা সম্ভব? 'এই সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী'দের মুখোশ খসে পড়ে গিয়েছিল ও 'হৃদয়ে পরিবর্তনের তত্ত্ব' প্রভৃতি একেবারেই অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সমগ্র ভারতের ভাষা ও লিপির মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মহাত্মার সহকর্মীরা কীভাবে হিন্দি ও দেবনাগরীকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজের তৈরি সংবিধান সভায় হিন্দি ও দেবনাগরীর জয় হয়েছিল মাত্র এক ভোটে। তার জন্য কারসাজির প্রয়োজন হয়েছিল [Seling S. Harrison, India: The Most Dangerious Decades, Princeton and Madras, 1960, 9-10, 282]। যে নেতারা অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাঁদের জনসাধারণের কাছে হেয় করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলদের একটি অস্ত্র হয়েছিল।

৮ই জুন গান্ধী শরৎ বোসকে লিখেছিলেন, "নেহরু ও প্যাটেল অবিভক্ত বাংলার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তাঁদের মতে তফশিলী নেতাদের হিন্দুদের থেকে পৃথক করার এটা একটা কৌশল। এটা তাঁদের সন্দেহ নয় দৃঢ় বিশ্বাস।... তাঁরা আরও মনে করেন যে, তফশিলীদের ভোট কেনার জন্য জলের মত টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। যে ব্যবস্থাই হোক তার জন্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আগে চুক্তি হতে হবে। আমি যা দেখছি সেটা তোমার পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।" তিনি শরৎ বোসকে বাংলার ঐক্যের জন্য লড়াই বন্ধ করার ও বাংলা বিভাগের জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য উপদেশ দিলেন [CWG, LXXXVIII, 103]।

শরৎ বোসের উত্তরের অপেক্ষা না করে সেই সন্ধ্যাতেই তিনি তাঁর প্রার্থনা সভায় বললেন যে,

বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যাঁরা আন্দোলন করছিলেন তাঁরা জলের মত টাকা খরচ করে ভোট কিনছেন এটা তিনি জানেন; এইসব অসৎ দুর্নীতিমূলক কাজকে তিনি সমর্থন করেন না [ibid., 109-10]।

শরৎ বোস যখন তাঁকে তাঁর সংবাদদাতার নাম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করার জন্য বললেন ও তদন্ত করে সত্যতা নির্ধারণ করে ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাদের শাস্তি দেবার জন্য অনুরোধ করলেন তখন তিনি শরৎ বোসকে তাঁর ‘ক্রোধে’র জন্য তিরস্কার করলেন ও নাম (অর্থাৎ তাঁর সংবাদদাতা জহরলাল ও প্যাটেলের নাম) প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন [ibid., 110: also Pyarelal.op cit., 11, 188, 190]।

শরৎ বোসের উত্তরের থেকে সুরাবর্দির (সোহরাওয়ার্দীর) উত্তর আরও জোরালো হয়েছিল। তিনি গান্ধীকে লিখেছিলেন : “আমি দুঃখিত যে আপনার এই বিবৃতির দ্বারা বিষয়গুলিকে আপনি তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন। ঐক্যবদ্ধ বাংলার পরিকল্পনা অসৎ , এই বিবৃতি সংবাদপত্রগুলি খুবই আনন্দের সঙ্গে লুফে নিয়েছে। মিঃ গান্ধী, আমাকে মাফ করবেন, আপনার বিবৃতি যে অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে সে সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি বলতে চান তা নির্দিষ্ট না করে যাঁরা ঐক্যবদ্ধ বাংলায় বিশ্বাসী তাঁদের সবাইয়ের সম্বন্ধে আপনি কলঙ্ক রটনা করেছেন” [ibid., 190]।

কেউ কেউ বলেছেন যে, জিন্না প্রথমে অবিভক্ত ‘স্বাধীন’ বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাবকে সমর্থন করে পরে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এটি সম্পূর্ণ ভুল। প্যারেলাল লিখেছেন, জিন্না এই প্রস্তাবে রাজি ছিলেন যদি তার পরিবর্তে অবিভক্ত পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের মধ্যে পান [Pyarelal, op cit., II, 187]। এটিও সম্পূর্ণ অসত্য। জিন্না অবিভক্ত ‘স্বাধীন’ বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাবকে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছিলেন। গান্ধীর শিষ্য এই রকম অনেক অসত্যই পরিবেশন করেছেন।

১৭ই মে জিন্না মাউন্টব্যাটেনকে লন্ডনে টেলিগ্রাম করে দাবি করেছিলেন বিভাগের প্রশ্নে বাংলা ও পাঞ্জাবে গণভোট গ্রহণ করা হোক। মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত ও বর্মা কমিটি জিন্নার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল [TOP, X, 921-2]। ৩০শে মে মাউন্টব্যাটেন ভারতে ফিরে এলে জিন্না এই দাবি আবার করেছিলেন [Hodson, op cit., 310]। আমরা উল্লেখ করেছি এপ্রিলের শেষের দিকে তফশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল গণভোটের প্রস্তাব তুলেছিলেন, এবং কৃষক প্রজা পার্টির হুমায়ুন কবির ও অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা এই প্রশ্নে বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের দাবি করেছিলেন। এই প্রশ্নে বাংলার জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করার দাবি সুরাবর্দিও (সোহরাওয়ার্দী) করেছিলেন [The Stateman, 28 April 1947]।

মাউন্টব্যাটেনও এপ্রিলের শেষে ও মে মাসের প্রথমে বাংলায় গণভোট বা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মত নেবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। বারোজ জানিয়েছিলেন বাংলায় গণভোট নেওয়া সম্ভব। ১৪ই জুন শরৎ বোস গান্ধীকে লিখেছিলেন: “আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যদি গণভোট গ্রহণ করা হতো তাহলে হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাধিক্যে বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন” [Quoted in Hasim, In Retrospection, 161] ।

যে ‘মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা’ নেহরু-প্যাটেলরা গ্রহণ করেছিলেন তাকে অনুমোদনের জন্য ১৪ই ও ১৫ই জুনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আবদুল গণি বলেন, “পাঠান ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান যাঁরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের প্রতি কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।” তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “পাঞ্জাব ও বাংলায় গণভোটের দাবি কেন করা হলো না?” অন্ধ্রের জগন্নাথ রাও অভিযোগ করেন যে, বাংলা, পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের জনগণকে তাঁদের মতপ্রকাশের কোনো কোনো সুযোগ দেওয়া হলো না; এমনকি সীমাবদ্ধ গণভোট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে হবে বলে স্থির হয়েছে তাতে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশ্ন নেই যদিও স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য এই প্রদেশগুলির জনসাধারণের মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে [IAR, 1947,1, 131]।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওই অধিবেশনেই নেহরু বলেছিলেন: “...আমি ও আমার সহকর্মীরা একমত যে দেশবিভাগের প্রশ্ন জনগণের রায়ের জন্য তাঁদের কাছে পেশ করতে হবে” (“... what myself and my colleagues have agreed to is that the issue of partition should be referred to the people for verdict”) [SWN, 2nd Series, III, 111] । ভারতবর্ষকে দুটো রাষ্ট্রে বিভক্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরে- যে সিদ্ধান্ত দু’মাস পরে কার্যকর হবে এবং কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে- নেহরু এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন!! এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে নেহরুর জুড়ি ছিল

না। সিদ্ধান্ত নেবার আগে শুধু জনগণের রায় নয়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কিমিটির রায়ও নেওয়া হয়নি।কাজটা সম্পন্ন করে- তর্ক যখন নিরর্থক- তখন অনুমোদনের জন্য কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছিল।

প্রশ্নটি সেদিনকার বাংলার ৬ কোটিরও বেশি অধিবাসী ও তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা ছিল। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা অমৃতবাজার বা বার লাইব্রেরী প্রভৃতি সংগঠনগুলির এ.আই.সি.সি. অফিসে পাঠানো প্রস্তাব জনগণের মনোভাবের সার্থক প্রতিফলন নয়। শরৎ বোসের বক্তব্য ছাড়াও বারোজ জানিয়েছিলেন যে, হিন্দু জনমত দেশভাগের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। একমাত্র গণভোটের মাধ্যমেই এই জীবন-মরণ সমস্যার উপর সঠিক মতামত জানা যেতো।

গণভোট হলো না কেন? নেহরু-প্যাটেল গণভোটের বিরুদ্ধে ছিলেন। ২৫শে মে নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নেহরুর সেই দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে উঠেছিল [TOP, X, 1040-1]। ৩০শে জুন ১৯৪৮-এর পরিবর্তে ১৯৪৭ সালের মধ্যে 'যথাশীঘ্র সম্ভব' ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশরাজের উপর নেহরু-প্যাটেলদের ক্রমাগত চাপ (এবং বিনিময়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কখনো না ছাড়ার প্রতিশ্রুতি) গণভোটকে বানচাল করারই কৌশল ছিল।

উৎসঃ সুনীতি কুমার ঘোষ, কারা বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করলো এবং কার স্বার্থে, হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ, সময় প্রকাশন, ২০১২ (পৃষ্ঠা ২৬৮-২৭৩)

পর্ব ৩

আমরা উল্লেখ করেছি যে, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে যে পরিকল্পনা পরিচিত তা মূলত রচনা করেছিলেন প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করে ভি. পি. মেনন [Menon, op cit., 364-5]।

এই পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত খসড়া ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে অথবা ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করে মেনন তৈরি করেছিলেন।

তাঁরা স্পষ্টই বলেছিলেন যে, খসড়া পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সেই সময়ে বিভিন্ন জাতিসত্তার যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উঠেছিল- যাকে 'কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা' ("centrifugal tendencis") বলা হয়েছে- তাকে রোধ করার জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা [Ibid., 358-9]। অতএব গণভোটের মাধ্যমে বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে স্বীকার করার প্রশ্নই ছিল না নেহরু-প্যাটেলদের কাছে।

গণভোট যাতে না হতে পারে, কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতাগুলি যাতে শক্তিশালী না হতে পারে, তার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-বিরোধী শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের অন্যান্য অংশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল যত শীঘ্র সম্ভব ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে দিল্লীর গদি লাভ করা। নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষ্ণ মেনন ১৯৪৭-এর ১৩ই মার্চ মাউন্টব্যাটেনকে এক দীর্ঘ চিঠিতে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব দিয়ে লিখেছিলেন,

বিভাগের বিরুদ্ধে বাংলার তুলনামূলকভাবে প্রবল বিরুদ্ধতা আছে। তবু স্থায়িত্বের (stability-র) জন্য দেশবিভাগ-রূপ দাম বাংলাকে দিতে হবে [Mansergh, N. (Editor-in-Chief), Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7, সংক্ষেপে(TOP), IX,949]।

প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের স্থায়িত্ব? অবশ্যই বিড়লা-গোয়েঙ্কা প্রমুখ বড় মুৎসুদ্দিদের পুঁজির স্থায়িত্ব- তাদের শোষণের স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধি। অন্যদিকে, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে অসংখ্য বাঙালীর জীবন, বাসভূমি ও ভবিষ্যৎ অস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত-বর্মা কমিটিকে মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন :

"বাংলা পৃথক ডোমিনিয়ন হিসাবে থাকতে সক্ষম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় কমনওয়েলথের জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে শিখদের মত বাংলার ঐক্যকে অবশ্যই বলি দিতে হবে…"[See Moore, Endgame of Empire, 7,170]।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার মুৎসুদ্দিদের যূপকাষ্ঠে বাংলা ও পাঞ্জাবের জনগণকে বলি দেওয়া হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হবার পরে ৫ই জুন বি. এম. বিড়লা প্যাটেলকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন :

“আপনি যা চেয়েছিলেন সেভাবেই সব ঘটেছে। বাংলাকে বিভিক্ত করার প্রশ্নটাও যে আপনি সমাধান করেছেন তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত ” [Durga Das (ed) op cit., IV, 55-6]।

বিড়লা প্রমুখ বড় মুৎসুদ্দিদের অনেক দিনের পরিকল্পনা সফল হলো। যখন অসংখ্য বাঙালীর মনে দুর্ভাবনা, আতঙ্ক ও গভীর নিরানন্দ তখন বড় মুৎসুদ্দিরা আনন্দিত, উৎফুল্ল ও উল্লসিত। ওই চিঠিতেই বি. এম. বিড়লা প্যাটেলের কাছে দুটি সুপারিশ করেছিলেন।

এক, হিন্দু ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে হিন্দুস্থানকে হিন্দু রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা হোক। দুই, ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা (অর্থাৎ মুখমন্ত্রী) হিসাবে শ্যামপ্রসাদকে নির্বাচন করার জন্য কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটি উপযুক্ত উপদেশ পাঠান। (বলা বাহুল্য, শ্যামাপ্রসাদ সারা ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন ও কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যও ছিলেন না) ।

বাংলা বিভাজনের পক্ষে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের, বিশেষ করে নেহরু, এবং কিছু পণ্ডিতদের একটি যুক্তি উল্লেখ করতে চাই। এঁরা বলেছেন, প্রথমে পৃথক বাংলা রাষ্ট্র হলেও পরে সমগ্র বাংলা পাকিস্তানে চলে যেতো। মুসলিম লীগের তাই ছিল উদ্দেশ্য; অবিভক্ত পৃথক বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিল তাদের একটি কৌশল। শরৎ বোস ও কিছু হিন্দু নেতা দূরদৃষ্টির অভাবে এই কৌশলের শিকার হয়েছিলেন। দেখা যাক এই যুক্তির কী ভিত্তি আছে।

প্রথম, বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেস নেতারা ও লীগ নেতারা যে সংশোধিত খসড়া সংবিধান রচনা করেন তার প্রথম ধারা ছিল : স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। কোনো যুক্তরাষ্ট্রে (অর্থাৎ ভারত বা পাকিস্তানে) যোগদান করতে হলে বাংলার আইনসভার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন চাই। এই ধারা অবিভক্ত বাংলার পৃথক অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতো।

দ্বিতীয়, ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে নির্বাচনের আগে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ‘শুরু হোক সংগ্রাম’ (‘Let us go to war’) নামে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল :

“স্বাধীন ভারত কখনও এক দেশ ছিল না। স্বাধীন ভারতীয়েরা কখনও এক জাতি ছিল না। অতীতে মোগল ও মৌর্য আধিপত্যে ভারত ছিল অখণ্ড এবং বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্যে রয়েছে অখণ্ড। স্বাধীন ভারতকে আল্লাহতায়ালা যেমন সৃষ্টি করেছেন সেইভাবে হতে হবে একটি উপমহাদেশ যেখানে প্রতিটি বসবাসকারী জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিদের প্রতি কংগ্রেসের যতই দুর্বলতা থাকুক এবং অখণ্ড ভারতের দোহাই দিয়ে সমগ্র ভারতকে শোষণ করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য তাঁরা যতই সুযোগ সৃষ্টি করুণ, প্রতিটি ভারতীয় মুসলিম ভারতে কংগ্রেস কর্তৃক যে কোনো চক্র, গ্রুপ অথবা সংগঠনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগকে প্রতিরোধ করবে ” [আবুল হাশিম, In Retrospection-এর শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ আলী কর্তৃক অনুবাদিত আমার জীবন ও বিভাগপুর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, কলিকাতা, ১৯৯৮, ১৫২] ।

ফজলুল হক প্রমুখ অনেক বাঙালী মুসলমান নেতার মত লীগেরও অনেক নেতা যেমন আবুল হাশিম দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে তিনি বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হবার পরে লীগ বাংলায় আগের থেকে অনেক বেশি সংগঠিত হয়েছিল। বাংলায় লীগের বড় অংশের উপর তাঁর ছিল ব্যাপক প্রভাব। আমরা দেখেছি, ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব ছিল মূলত ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বে মুসলমান-প্রধান দুটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব। কিন্তু ১৯৪৬-এর প্রথমদিকে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন শেষ হয়ে যাবার পরে বিভিন্ন আইনসভায় নব-নির্বাচিত লীগ সদস্যদের এক সম্মেলন জিন্না দিল্লীতে আহ্বান করেছিলেন। ৭ই থেকে ১০ই এপ্রিল ১৯৪৮-এ সেই সম্মেলন হয়েছিল। সেখানেই প্রথম জিন্না দুই নয়, এক মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রের দাবি পেশ করেন। তার বিরোধিতা করে আবুল হাশিম বলেছিলেন যে, জিন্নার প্রস্তাব ‘বাতিলযোগ্য ও অবৈধ’ (‘void and ultra vires’), কারণ এই প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী ও লাহোর প্রস্তাবকে পরিবর্তন করার অধিকার আইনসভার সদস্যদের ছিল না [ঐ, পৃষ্ঠা ১০০]।

আমরা আগে উল্লেখ করেছি, শরৎ বোসের সঙ্গে ১০ই মে ১৯৪৭-এ আবুল হাশিম যখন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক অবিভক্ত বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন, তখন হাশিম একই ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং একই ইতিহাস যা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছিল তার উপর জোর দিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, একজন বাঙালী বাঙালীই। উভয়েই হাজার মাইলেরও বেশি দূরের পাকিস্তানীদের শাসনকে ঘৃণা করে [Cited in Sunil Das, "The Fateful Partition and the Plan of United Sovereign Bengal " in Sarat Chandra Bose Commemoration Volume, 79; শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ আলী কর্তৃক অনুবাদিত আমার জীবন ও বিভাগপুর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, কলিকাতা, ১৯৯৮, ১৩০]।

বাংলার ব্যাপক মুসলমান নেতা ও কর্মী চেয়েছিলেন কেন্দ্রের শাসন থেকে সম্পূর্ণ স্বশাসিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র যেখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ সৌহার্দ্যের সঙ্গে বাস করবে। আমরা আগে বলেছি, ১৯৪৪ সালে বাংলার গভর্নর কেসি এই কথাই ওয়াভেলকে জানিয়েছিলেন। আমরা আরও উল্লেখ করেছি, ১লা মার্চ ১৯৪৬-এ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে লেখা অধ্যাপক হোরেস আলেকজান্ডারের চিঠির বক্তব্য। আমরা তা পুনরুল্লেখ করছি। তিনি লিখেছিলেন : উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সমগ্র বাংলাকে অথবা পূর্ব বাংলাকে জুড়ে দিতে একজনও বাঙালী মুসলমান আন্তরিকভাবে চান বলে আমি বিশ্বাস করি না। হিন্দুদের মতই সমান দৃঢ়তার সঙ্গে বাঙালী মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত তাকে বাধা দেবেন- যদিও আগামী নির্বাচনে মুসলিম লীগ বোধ হয় প্রায় সব আসনে জয়ী হবে [TOP. VI, 109]।

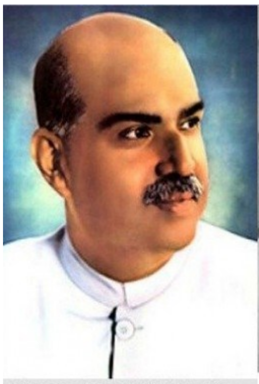
Shyama Prasad Mukherjee

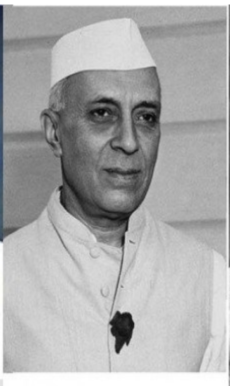
Neheru

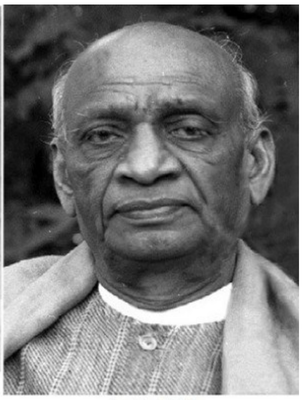
Sardar Patel

তৃতীয়, ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, গান্ধীর কাছে আবুল হাশিমের বক্তব্য ও আলেকজান্ডারের ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। বাংলা ও ভারত-বিভাজনের কিছু পর থেকেই পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বিদ্রোহের সূচনা হয়। ১৯৫২ সালের শুরুতে এই বিদ্রোহ কিছু বলিষ্ঠতা লাভ করে এবং ১৯৭১-এ তার পরিণতি হয় পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী শাসনের অবসানে এবং স্বতন্ত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়।

নেহরুদের অভিযোগ যে অবিভক্ত পৃথক বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার মুসলমান নেতাদের পাতা একটা ফাঁদ ছিল, তা বাংলার চরম দুর্গতির জন্য তাঁদের দায়িত্বকে ঢাকা দেবার একটা স্বভাবসিদ্ধ অপকৌশল ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিছু বাঙালী হিন্দু পণ্ডিত বা অপপণ্ডিত আজও যে নেহরুর সুরে সুর মেলান- সেটা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আমরা আগে দেখেছি, মুসলমান বড় মুৎসুদ্দি ইস্পাহানিও অবিভক্ত স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে একটি ফাঁদ বলেছিলেন। নেহরুদের সঙ্গে তফাত এই যে, তিনি এটিকে হিন্দুদের চক্রান্ত বলেছিলেন। তার মতে, বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও শিক্ষায় ও আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমানদের গ্রাস করে ফেলা ছিল হিন্দুদের রচিত এই ফাঁদের উদ্দেশ্য। বিড়লাদের রাজনৈতিক মুখপাত্ররা এবং ইস্পাহানি, দুই বিরোধী পক্ষ, এই পরিকল্পনাকে আক্রমণ করেছিলেন- অবশ্য দুই বিপরীত দিক থেকে। সেটাই স্বাভাবিক। এই পরিকল্পনা দুই মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীরই স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। বাংলা-বিভাজনে দুইয়েরই স্বার্থ ছিল।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুণগ্রাহী হিন্দু মহাসভার নেতা বলরাজ মাধোক লিখেছিলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন : "কংগ্রেস ভারত-বিভাজন করেছিল আর আমি করেছিলাম পাকিস্তান-বিভাজন" [Balraj Madok, "Dr Shyamaprasad Mookerjee", in S.P.Sen (ed), Dictionary of National Biography, III, Calcutta, 1974, 173]। তিনি দাবি করেছেন যে, বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে তিনিই পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাবকে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

এ দাবি একান্তই হাস্যকর হতো যদি বাংলা ও পাঞ্জাব-বিভাজন তথা ভারত-বিভাজন এত মর্মান্তিক না হতো। এই বিভাজনে শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার কী গুরুত্ব ছিল সে সম্বন্ধে বেশি

কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁদের গুরুত্বের পরিমাপ কিছুটা হয়েছিল ১৯৪৫-এর শেষের দিকে কেন্দ্রীয় আইনসভার এবং ১৯৪৬-এর প্রথম দিকে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর নির্বাচনে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেনি।

সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কংগ্রেস ও লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেই আপস করেছিল এবং সেই আপসের ফলেই বাংলা ও পাঞ্জাব-বিভাজন তথা বিভাজন হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদরা অবান্তর। আমরা দেখেছি, বিড়লা-গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলরা দীর্ঘদিন ধরে চেয়েছিলেন হয় অখণ্ড ভারত অথবা বাংলা ও পাঞ্জাবকে চিরে এই দুই প্রদেশের এক এক খণ্ড তাঁদের শাসিত ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিতে। দ্বিতীয়টা ছিল তাঁদের ন্যূনতম দাবি। এবং সেই দাবি তাঁরাই আদায় করেছিলেন। (পরে পাকিস্তানকে যাঁরা বিভাজন করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন পূর্ব বাংলার জনগণ-১৯৭১ সালে।)

তবে শ্যামাপ্রসাদদের ভূমিকা কি কিছু ছিল না? অবশ্যই ছিল। যে বিপুল বিরাট নরমেধের আয়োজন হয়েছিল সেদিন, বিড়লা-নেহরু-প্যাটেলদের অনুগামী হয়ে এবং তাঁদের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে তাঁরা সেই যজ্ঞে কিছু ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। আমরা সেই প্রসঙ্গে আসছি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন শ্যামাপ্রসাদ পরিচালনা করছিলেন তখন ১৯শে মার্চ ১৯৪৭-এ এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন :

"প্রদেশটি যে গুরুতর সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধান হচ্ছে বাংলার বিভাজন। এর ফলে যে যে অঞ্চলে বাংলার দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য আছে সেখানে তারা নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিকশিত করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে, তারা উভয়ই শীঘ্র উপলব্ধি করবে যে, দুটি (প্রস্তাবিত) প্রদেশে সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল হবে"[Lar, 1947,1, 48; quoted in Gordon, Brothers against the Raj, 574-5]।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু জাতীয়তার প্রবক্তারা বাংলার হিন্দু-মুসলমানের একই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নন, যদিও রবীন্দ্রনাথ থেকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই ঐক্যের কথা বলে গেছেন। গান্ধী, জিন্না, নেহরুরাও সেটা স্বীকার করেছিলেন)।

পরে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (যিনি ওই সময় বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছিলেন) এক সাক্ষাৎকারে গর্ডনকে বলেছিলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ সেই সময়ে একান্তে বলছিলেন:

এখন আমরা বিভক্ত করি এবং ইংরেজরা চলে যাক। তারপর আমরা সমগ্র অঞ্চল দখল করে নেবো [Interview with S.M. Ghosh, New Delhi, 26 June 1972, ibid, 575]।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে। কারণ, বাংলা-তথা ভারত-বিভাজন ঠিক হয়ে যাবার পরেই হিন্দু মহাসভা কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাব থেকে মনে হয় শ্যামাপ্রসাদ মাত্র কিছুদিন আগে (১৯শে মার্চ) বাংলা বিভাজনের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন এবং 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবে বলা হয়েছিল :

"...যতক্ষণ না বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শান্তি আসবে না" [LAR, 1947,1,74 and Bengal Governor's Reports for first half of June, July and Second half of July, quoted in Gordon,ibid, 586]।

হিন্দু মহাসভা আরও বলেছিল, প্রস্তাবিত এলাকা-বন্টন ছিল অমুসলমানদের প্রতি অবিচার এবং মহাসভা তার জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। তাছাড়া, তাদের দাবি ছিল

পূর্ববাংলার হিন্দুরা ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত হোক। তাদের বিশ্বাস ছিল, ভারতীয় ইউনিয়নে পূর্ববাংলাকে ফিরিয়ে আনা মাত্র সময়ের প্রশ্ন [Ibid., 587]।

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারাও নিশ্চিত ছিলেন, পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তান হিন্দুস্থানে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। প্যাটেলও এই বক্তব্য রেখেছিলেন যে,

শক্তিশালী কেন্দ্রের অধীনে ভারতবর্ষ এত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে যে পাকিস্তানকে শীঘ্রই তাঁরা ফিরে পাবেন [G. M. Mandurkar (ed.), Sardar Patel-In Tune with the Millions, I (Birth-Centenary Volume

II), Ahmedabad, 1975, 5-9: see also Leonard Mosley, The Last Days of the British Raj, 107]।

শেষ পর্ব

বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সময়ে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য ছিল, পূর্ববাংলায় তথা পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবাংলায় ও হিন্দুস্থানে মুসলমানদের জামিন (hostage) হিসাবে ব্যবহার করা হবে [Gordon, Brothers against the Raj, 575]। অর্থাৎ পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে পশ্চিমবাংলা বা ভারতের অন্যত্র নিরপরাধ মুসলমান অধিবাসীদের উপর তার শোধ নেওয়া হবে। এপ্রিল ১৯৪৭-এ অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলন থেকে পূর্ববাংলার অমুসলমানদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল,

"তাঁদের পিছনে থাকবে শুধু নৈতিক নয়, কোনো পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার কর্তৃক দৈহিক বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা" ("they will have the sanction, not only simply moral, but in certain eventualities also physical, of the new Government of West Bengal") [Amrita Bazar Patrika, 9.4.1947, cited in Shila Sen, Muslim Politics in Bengal, 229,fn 90]।

এখানে উল্লেখযোগ্য, সংখ্যালঘুদের জামিন রাখার তত্ত্ব কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের মুখেও শোনা গিয়েছিল। আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে খোলাখুলিই বলা হচ্ছিল যে, পাকিস্তানে হিন্দুদের ভয় করার কিছু নেই, কারণ ভারতবর্ষে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলমান থাকবে; পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে তার ফল ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভোগ করতে হবে। ১৯৪৭-এর জুনের মাঝামাঝি সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় সিন্ধুর প্রতিনিধিরা ভারত-ভাগের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। তাঁদের সবরকম আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। আজাদ আরও লিখেছেন, প্রকাশ্য মঞ্চে না হলেও ঘরোয়া আলোচনায় তাঁদের একথাও কিছু লোক বলছিল যে, পাকিস্তানের তাঁদের কোনো ক্ষতি বা অমার্যাদা হলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর ভারতবর্ষ তার প্রতিশোধ নেবে। আজাদ বলেছেন, কিরণশঙ্কর রায় এই বিপজ্জনক তত্ত্বের দিকে (হিন্দুস্থানে মুসলমানেরা এবং পাকিস্তানে হিন্দুরা অপর রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের জন্য জামিন-hostage-থাকবে) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রায় কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনিকে বলেছিলেন, এই তত্ত্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক। আজাদ বলেছেন, কিরণশঙ্কর রায়ের কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি। অনেকেই তাঁর আশঙ্কাকে উপহাস করেছিল [Azad, op cit., 198-9]।

একই তত্ত্ব ছিল কোনো কোনো মুসলমান নেতারও। ৭ই অক্টোবর ১৯৪২-এ জিন্নাকে একটি চিঠিতে চৌধুরী খালিকুজ্জামান লিখেছিলেন : "পাকিস্তান ধারণার পিছনে অন্যতম মৌলিক নীতি হচ্ছে, হিন্দু প্রদেশে মুসলমানদের মত মুসলমান প্রদেশেও [হিন্দুদের] জামিন (hostage) রাখতে হবে। আমরা যদি লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের [আঞ্চলিক পুনর্গঠনের ফলে] আমাদের প্রভাবের বাইরে চলে যেতে দিই তাহলে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশে মুসলমানদের নিরাপত্তা খুবই হ্রাস পাবে" [Choudhury Khaliquzzaman, Pathway to Pakistan, 425]।

শ্যামাপ্রসাদ, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ যাঁরা বাংলার হিন্দুদের ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বাংলার দুর্গত হিন্দু জনসাধারণের প্রতি তাঁদের দরদের উল্লেখ করতে চাই। তাঁরা বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার পরে পূর্ববাংলা থেকে যে হিন্দুরা ভিটেমাটি ত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা নেহরু-প্যাটেল-শ্যামাপ্রসাদদের কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের কাছ থেকে কী রকম সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন তার একটি নমুনা আমরা দিচ্ছি।

১লা ডিসেম্বর ১৯৪৯-এ তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লিখেছিলেন :

"আপনার ধারণা 'ত্রাণ' ও পুনর্বাসনের জন্য আপনার সরকার বিরাট টাকা দান করেছে। আপনি কী উপলব্ধি করেন যে,

আপনার সরকারের কাছ থেকে ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ এই দুই বছরের জন্য ওই উদ্দেশ্যে মোট অনুদান পাওয়া গেছে ৩ কোটি টাকার সামন্য কিছু বেশি ও বাকি প্রায় ৫ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আমি বলছি, ২৬ লক্ষ বাস্তুহারাদের জন্য এ পর্যন্ত যে অনুদান দেওয়া হয়েছে তা তুচ্ছ, কারণ দ'বছর জনপ্রতি তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ টাকার মত"[Quoted in Sarji Chakrabarti, with Dr B. C. Roy and other Chief Ministers, Calcutta, 1974, 140-2]। এই নীতির ফলে পশ্চিমবাংলাও পঙ্গু হয়ে গেছে। নেহরুদের অন্যান্য নীতিও একই উদ্দেশ্য সাধণ করেছে [See, for Instance, Ranajit Roy, The Agony of West Bengal; A Study in Union-State Relations, Calcutta, 1972 (second Enlarged edition)]।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী উৎসবের আয়োজন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই পার্টি শ্যামাপ্রসাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জনসংঘের নতুন সংস্করণ। পশ্চিমবাংলার 'মার্কসবাদী' উপ-মুখ্যমন্ত্রী (বতর্মানে মুখ্যমন্ত্রী) এই পার্টির সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্যের উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ 'জনগণের এক মহান নেতা' নেতা ছিলেন এবং তাদের 'বামফ্রন্ট' সরকার এই উপলক্ষে উৎসব পালন করবে। করাই স্বাভাবিক। তাদের চোখে আর একজন মহান নেতা ছিলেন বিধান চন্দ্র রায়।

এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা বলবো। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রধানত দু'জাতের মানুষ আছে : মুষ্টিমেয় শোষক ও শাসক এবং তাদের অনুগৃহীত জীব এক জাত এবং অন্য জাত হচ্ছে বাকি জনগণ। প্রশ্ন হচ্ছে, শ্যামাপ্রসাদ কোন শিবিরে ছিলেন- বিড়লা-গোয়েঙ্কা প্রভৃতিদের এবং তাদের রাজনৈতিক মুখপাত্রদের শিবিরে, না জনগণের শিবিরে? কী ছিল তাঁর রাজনীতি?

নিপীড়িত জনগণকে দমন করে রাখার শোষক ও শাসকদের হাতে পুলিশ মিলিটারি লাঠি গুলি আইন আদালত জেল ইত্যাদি ছাড়াও আরও অস্ত্র আছে। সাম্প্রদায়িকতা, 'জাতের ব্যারাম' (casteism), উগ্র জাতীয়তাবাদ তাদের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র। এখানে Howerd Zinn- এর A People's History of the United States থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "Indeed, as the nations of Europe went to war in 1914, the government flourished, patriotism bloomed, class struggle was stilled, and young men died in frightful numbers on the battlefields- often for a hundred yards of land, a line of trenches… Ten million were to die on the battlefield; 20 million were to die of hunger and disease related to the war. And no one since that day has beeb able to show that the war brought any gain for humanity that would be worth one human life "[Howard Zinn, A People's History of the United States, New York, 1990th edn., 350-emphasis added].

অর্থাৎ সংক্ষেপে, য়ুরোপের দেশগুলো যখন ১৯১৪-তে যুদ্ধ শুরু করলো, তখন সরকারগুলোর শ্রীবৃদ্ধি হলো, দেশপ্রেমের বন্য বয়ে গেলো, শ্রেণীসংগ্রাম স্তব্ধ হলো, আর যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যায় তরুণেরা প্রাণ দিল- অনেক ক্ষেত্রে সামান্য একটু জমির জন্য।…যুদ্ধে মারা গেলো একটি মানুষ; দু'কোটির মৃত্যু হলো যুদ্ধ-জনিত অনাহার ও অসুখে। এখন পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেননি যে এই যুদ্ধের ফলে মানবজাতির এমন লাভ হয়েছে যার মূল্য একটি মানুষের জীবনের সমতুল্য।

রাষ্ট্রগুলির নেতাদের মধ্যে বিরোধ ছিল: বিরোধ ছিল রাষ্ট্রের সীমানা, উপনিবেশ, প্রভাবাধীন এলাকা ইত্যাদির জন্য। বিরোধ ছিল না রাষ্ট্রগুলির জনগণের মধ্যে। কিন্তু শোষক ও শাসকেরা উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে শোষক ও শাসকদের শিবিরে শোষিত জনগণকে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল; তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক রাষ্ট্রের শোষিত জনগণকে অন্য রাষ্ট্রের শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদের মত ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে শোষক ও মাসকেরা নিপীড়িত জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাঁদের এক অংশকে আর এক অংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে এবং এইভাবে শাসন ও শোষণের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। ধর্ম-নির্বিশেষে শোষিত জনগণের ঐক্যই শোষণ থেকে, নানবিধ অত্যাচার, তাঁদের মুক্তির পূর্বশর্ত। (ধর্ম প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার।)

শ্যামপ্রসাদের রাজনীতি ছিল এই ঐক্যকে চূর্ণ করা; শ্বাপদ ও শিকারকে এক শিবিরভুক্ত করা, যার অর্থ জনগণকে দুঃখ-

দুর্শশার মধ্যে নিমজ্জিত রাখা। শ্যামাপ্রসাদ নিজে ছিলেন শ্বাপদদের শিবিরে- বিড়লা-গোয়েঙ্কাদের শিবিরে। বাংলা-বিভাজনের জন্য যারা দায়ী তিনি ও হিন্দু মহাসভা তাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। সেইজন্যই তিনি ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর নেহরু মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। এবং ৬ই এপ্রিল ১৯৪৮-এ মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত 'শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব' ('Industrial Policy Resolution') ও তার সাথে গৃহীত স্মারকলিপি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শৃঙ্খলাকেই দৃঢ় করার সংকল্প ঘোষণা করেছিল [See Suniti Kumar Ghosh, The Indian Big Bourgeoisie, 263]।

আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন :

অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার,
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।

আজও এই দেশে মৃত্যুরই কারবার চলেছে। শ্যামাপ্রসাদের উত্তরসূরিরা আজ একদিকে পারমাণবিক বোমার আস্ফালন করছেন আর অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের অঙ্গুলিহেলনে কংগ্রেস-প্রবর্তিত নয়া অর্থনীতির রূপায়নে মেতে উঠেছেন এবং কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাঁদের জীবনকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

আর একটি প্রশ্ন : 'জনগণের মহান নেতা' কে? নিপীড়িত জনগণ যে সব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত সেইসব শৃঙ্খলকে যিনি দৃঢ় করেন, জনগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন, তিনি জনগণের মহান নেতা? না, তিনি যিনি জনগণের আসল শত্রুদের চিহ্নিত করে তাঁদের ঐক্যকে দৃঢ়তর করে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সব শৃঙ্খল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনের দিক থেকে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে মহত্তর জীবনের অভিমুখে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যান?

১৯৪৭-এর ৮ই আগস্ট তারিখের রিপোর্টে লন্ডনে কর্তৃপক্ষকে মাউন্টব্যাটেন জানিয়েছিলেন, বাংলার গভর্নর বারোজ, যিনি শ্যামাপ্রসাদকে ভালোভাবে জানেন, মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন যে,

শ্যামাপ্রসাদ এতই নীচ যে তাঁর পেটের তলা দিয়ে সাপও গলতে পারবে না। ("...Borrows who knows him [Shyamaprasad] well, described him to me recently as being so low that a snake could not crawl under his belly.")[TOP. XII, 601]।

মাউন্টব্যাটেন নিজে ছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের আপন লোক; জনগণের স্বার্থের প্রতি শত্রুতা এবং নীচতা তাঁরও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।